“জমির আলী”

খন্দকার মোঃ আবদুল গণি

ছোটবেলা থেকেই স্বভাবটা ছিল কবি কবি যদিও কবিতানামক চপলা কুমারীর টিকিটির সন্ধান ও কোনদিন পাইনি। উপমা,অলংকার, ছন্দ আর মাত্রার সংমিশ্রনে কবিতা কুমারীর হৃদয় তুষ্ট হয় কিন্তু অত্যান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে আমার মত আনাড়ীর অনভিজ্ঞ হাতের স্পর্শে কবিতা কুমারী কোনদিনই তৃপ্ত এবং সন্তুষ্ট হতে পারেনি। কবিতা কুমারী ও আমাকে ছাড়ে না। দূর দিগন্তের মরিচীকার মত ঝিকিমিকি করে আমার অক্ষির সম্মুখে ওর রূপকে একটু দেখিয়েই বিদায় নেয় আর অল্প তুষ্ট আমার এই মন দু’চার কথা প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হয় কিন্তু সমাপ্ত করতে পারেনা। তাই কবিতার সাথে আমার প্রেম আর হলো না। আর প্রাপ্তি? যেখানে প্রেমই হয়নি সেখানে প্রাপ্তি আসবে কি ভাবে? অগত্যা বন্ধুরা সবাই মিলে আমায় পরামর্শ দিল সাংবাদিকতা করতে। সকলের যুক্তি আমার লেখার হাত নাকি খুবই খুবই ভাল! কিন্তু সমস্যা হলো দু’টো সার্টিফিকেট যা দিয়ে কোন দৈনিক পত্রিকার সাথে সর্ম্পক স্থাপন করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কতৃপক্ষের চাহিদা তিন-চারটি সার্টিফিকেট যা আমার কাছে নেই। তাই কোন দৈনিক পত্রিকার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলাম না। অগত্যা অদম্য ইচ্ছার কারণে দু’টো মাসিক পত্রিকার সাথে সম্পর্ক হল। ভাগ্যিস ওরা তিন-চারটে সার্টিফিকেট চায়নি! যদি চাইত তবে আমার আর কবিতার প্রেমের মতই অবস্থা হত।

সাংবাদিক হয়ে ও তৃপ্তি পেলামনা বরং আরও সমস্যা বাড়ল। আমার চারপাশে হর-হামেশাই যেসব ঘটনা ঘটে তা আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হবার আগেই দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আমি যে সেটাকে দেব কিন্তু কিভাবে? খবরটা বাসী হয়ে গেছে আর বাসী খবর পাঠক পড়েনা। টুকরো করে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ডাষ্টবিনে। দু’একজন অবশ্য পানি-ভাত গেলার মত গিলে যায় তবে সংখ্যায় নিতান্ত কম। শেষকালে সিদ্ধান্ত নিলাম প্রতিবেদন লিখব কিন্তু তাতেও বিপত্তি। একটি প্রতিবেদন লিখতে যে খরচ হয় তা সমপাদকের নিকট হতে পাওয়া যায় না। দারিদ্রতাময় জীবন শুধু শুধু একটি খরচ বাড়িয়ে কি লাভ? তাই সাংবাদিকতার ও ইতি ঘটল। তবে মাঝে মাঝে মানসিক শান্তি অবশ্য পাই। কোন অনুষ্টানে রিপোর্টের নাম করে টিকেট ছাড়াই ঢুকতে পারি। তাছাড়া প্রশাসনের নাকের ডগার উপর দিয়ে চলতে পারি এ জন্য যে সাংবাদিকরা অন্ততঃ ভালোমানুষ! এমনি যখন অবস্থা তখন একদিন হঠাৎ করেই কবিতা রাণীর সখী প্রকৃতিদেবী আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকলো। প্রকৃতিদেবীর এমন আহ্বানে আমি সাড়া না দিয়ে থাকতে পারলামনা তাই টেম্পুযোগে আমার অপেক্ষাকৃত প্রিয় স্থান হালিশহর বড়পোল বি,পি,এড কলেজের সামনে রেললাইনের পাশে প্রায় খানিকটা ষ্টেশন ঘেঁষে বসে পড়লাম। জায়গাটা মন্দ নয়। রেললাইনের পাশে ইউক্যালিপ্টাস,মেহগনি,আকাশফঁড়ি আরও নাম না জানা কতিপয় বৃক্ষ বন্ধুর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সহাবস্থানে অবস্থান করছে। এমনি মিষ্টি মধুর পরিবেশে কবিতা রানী আমায় আবছায়ার মত দেখা দেয়। আজ ও তার ব্যাতিক্রম ঘটলনা। কবিতা রানী আসবে আসবে এমনি অবস্থা ঠিক সে সময়ে দু’জনের প্রেমের মাঝে বাধা হয়ে

দাঁড়াল একটি ব্যাক্তি। হাতে লাঠি নিয়ে তেড়ে এসে কর্কস স্বরে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল– আপনি এখানে কি করছেন? উঠেন তাড়াতাড়ি এখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ।– কেন ভাই ? সংবিধানের ৩৮(ক) অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আমি এখানে বসতে পারি। – কোন দেশে আছেন? যে দেশ হরহামেশাই বোমার আঘাতে ঝল্‌সে যায় নিরীহ জনগণের দেহ সে দেশ স্বাধীন হয় কি ভাবে?

– তা ঠিক কিন্তু আমি তো আর সন্ত্রাসী নই।

– বিশ্বাস কি?

– মানে!

– মানে আবার কি। আপনি যে সন্ত্রাসী নন তার প্রমান কি? দাড়ি, টুপী আর সুন্নতি লেবাছ পরে ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বোমা মেরে যদি নিরীহ জনগণকে ঝলসে দিতে পারে তবে আমি আপনি কোন ছার।

– আসলে ওরা ধার্মিক নয়, ধর্ম ব্যাবসায়ী।

– অতশত বুঝিনা। আপনি উঠেন নইলে .....। 'নইলে' শব্দটি শুনে বুঝতে পারলাম এখন বেশি কিছু বলতে গেলে ঝগড়া অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ঝগড়া করতে মন সায় ও দিচ্ছে না আবার উঠতে ও মন চাচ্ছেনা। শেষকালে কোন উপায়ন্তর না দেখে আশার সম্বল হিসেবে দেখা দিল মাসিক প্রত্রিকার দু'টো কার্ড। সিদ্ধান্ত নিলাম কার্ড দু'টো দেখিয়ে যদি মন গলে যায় তবে তাই করব আর না গললে বাধ্য হয়ে উঠে যেতে হবেই। যেমনিভাবা তেমনি কাজ। কার্ড দু'টো পকেট থেকে বের করে সামনে ধরতেই অগ্নিমূর্তি একেবারে বরফের মত ঠান্ডা হয়ে গেল আর ঠিক তখনই আমাকে উদ্দেশ্য করে আমতা আমতা স্বরে বলে উঠল– আপনি যে সাংবাদিক তা আগে বললেই হতো। তাহলে কি আর এমন ঝগড়া সৃষ্টি হতো। আপনারা হলেন জনগণের প্রতিনিধি। আপনাদের সাথে কি অন্যায় করতে পারি? – বলতে আর দিলেন কোথায়? এসেই তো শুরু করে দিলেন অন্য কথা।– আমার ভুল হয়েছে ক্ষমা করবেন। আপনি বসুন যতক্ষন ইচ্ছা হয় বসে লিখুন। কোন সমস্যা হলে আমাকে ডাকবেন। – আচ্ছা। লোকটি উঠে চলে গেল । বেশ ভূষণ দেখে বুঝতে পারলাম লোকটি কেয়ার টেকার। কেয়ার টেকার হলেও কিছুটা শিক্ষিত তা অন্ততঃ আঁচ করা যায়। বেশ খানিকটা সময় বসে থাকার পর ভাবলাম উঠে চলে যাওয়াই ভালো। থাকো কবিতা রাণী তোমার সখির কাছে বলে ব্যাগ গুছিয়ে উঠে হাঁটতে লাগলাম। আকস্মাৎ সামনে দৃষ্টি পড়ামাত্র দেখতে পেলাম বেশ খানিকটা দূরে একটি লোক আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। লোকটি নিকটে এসে আচমকা আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল–

– আপনে কি সাংবাদিক?

– কেন বলুন তো।

– শুনলাম আপনে জ্ঞানী-গুণী মানুষ। থয় আমার একখান কাম কইর‍্যা দিবেন?

– জ্বি বলুন।

– আমার বউ একখানা চিডি দিছে। লেহা-পড়া জানিনা তো যদি পইড়্যা দিতেন...।

– অপরের চিঠি পড়া কি ঠিক?

– আমি তো পইড়্যা দিতে কইছি। থয় অসুবিধা কনে?

– ঠিক আছে দিন।

লোকটি চিটি বের করার জন্য পকেটে হাত ঢোকালো। এই ফাঁকে আমি লোকটিকে খুঁটে খুঁটে দেখলাম। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মুখে কাঁচা-পাকা ফরমাল কাট দাড়ি। গায়ের রং মিশকালো। দূর থেকে দেখলে মনে হয় শুকনো শরীর বাতাসের ভরে সহ্য করতে পারবেনা। কিন্তু নিকটে এসে দেখা যায় শুকনো শরীরের মাংসপেশী গুলো অত্যান্ত সবল এবং সজীব। মিশকালো চামড়ার গায়ে অসংখ্য লোমের অরণ্য। চওড়া কপাল। বয়সের সংগে তাল রেখে কপালের সামনে অনেকখানি চুল ঝরে পড়ার সেটাকে আরো প্রশস্ত দেখায়। আরও কিছু দেখার সাধ ছিল কিন্তু আর সম্ভবপর হয়ে উঠল না। ইতমধ্যে পকেট থেকে চিটি বের করে আমার সামনে মেলে ধরল। চিঠিটি খুলে পড়তে লাগলাম। চিঠিতে বেশি কিছু লেখা নেই। আধাভাঙা মেয়েলি হাতের লেখা একটি বাক্য বারংবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। তাতে লেখা আছে " আজ রাতে ঘরে না এলে আমার মরা মুখ দেখবেন"। বাক্যটি লোকটিকে বলামাত্র সারামুখে এক কৌতুকের হাসি এনে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল–

– মাইয়্যা মানুষ, মরতে ও পারে বাঁচতেও পারে।

– আপনি হাঁসছেন ! যদি সত্যি সত্যি মরে যায়?

– আরে না ভাই, মরব না। কাইল রাইতে ঝগড়া হইছে তো তাই..।

– সেকি ! ঝগড়া করলেন কেন?

– হ্যায়-হ্যার মায়ের লগে বস্তিতে ভাড়া ঘরে থাহে। আমি কইলাম আমার লগে চইল্যা আসো বাসা ভাড়া নিমু। হ্যায় কয় কি জানেন ?

– কি কয়?

– হ্যায় কয় আমি চইল্যা গ্যালে মায়রে দেখব কিতা? আমি কইলাম তোমার মায়রে লইয়্যা লও। হ্যার মায় নাকি আইব না।

– এই সামান্য কারণে ঝগড়া।

– আরে না ভাই। আরও কারণ আছে।

– কি কারণ?

– আমি কইলাম এই সুময় তুমি চাকরি কইর‍্যোনা। কিন্তু কেডায় শোনে কার কথা? আসলে ছোড মাইয়্যা বিয়া করলে এমনিই হয়।

– এই সময় মানে? আর ছোট মেয়ে বিয়ে করেছেন ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।

– বুঝলেন না? এই সময় মানে আমার বউয়ের বাচ্চা হইব। আর ছোড মাইয়্যা মানে আমার বউয়ের বয়েস কম। আপনাগো লগে মানাইত।

– তবে তো মহা অন্যায় করেছেন। আমাদের কপালে ঝাঁটা মেরেছেন।

– কি যে কন ভাই। আপনেরা এমুন মাইয়্যা বিয়া করবেন কেন?

– এমন মেয়ে মানে ?

– বেশ্যা!

– চমকাইলেন কেন? ঘেন্না অয় বুঝি?

– না না ঘৃনা করব কেন? নিজের স্ত্রীকে আপনি বেশ্যা বললেন তো তাই।

– যা সত্য তাই কইলাম। বেবাক লোকই বেশ্যা কয়। থয় আমি কইনা।

– আশ্চর্য ! আপনার কাহিনীটা আমাকে বলবেন কি? জানতে বড্ড সাধ হচ্ছে।

– কমু , আপনারে কওন যায়। থয় তার আগে চলেন ঐ দোকানে গিয়া এককাপ চা খামু। তারপর।

– ঠিক আছে চলুন।

দু'জনে একত্রে চা ষ্টলের দিকে হাঁটতে লাগলাম। চা ষ্টল বেশী দূরে নয়। দু'তিন মিনিট হেঁটে চা ষ্টলে পৌঁছলাম। লোকজনের ভীড় খুব একটা বেশী নয়। একেবারে কোণার বেঞ্চে দু'জনে বসে পড়লাম। হোটেল বয় দু'কাপ চা দিয়ে গেল। চা খেতে খেতে লোকটি বলতে আরম্ভ করল–জোয়ন কালে একডা মাইয়্যারে মন দিছিলাম। থয় বিয়া করতে পারি নাই। হেই থেইক্যা ভাবছিলাম আর বিয়া করমুনা। চইল্যা আইলাম এই শহরে। আইস্যা কাম লইলাম ষ্টেশনে কুলির কাম। একদিন রাইতে কাম শ্যাষে ষ্টেশনের এদিকটায় ঘুরছিলাম। হঠাৎ দেখতে পাইলাম একডা মাইয়্যা ঐ যে দেখছেন ঐ গাছের লগে রশি বাঁধছে। মইর‍্যা যাওনের লাইগ্যা। আমি দৌড়াইয়া গিয়া হাত থেইক্যা রশি কাইড়্যা নিলাম। তখন হ্যায় কইলো –

– আমারে বাঁচালেন কেন? আমি মইর‍্যা যামু।

– মরবা ক্যান?

– থয় কি করুম। আমার বাঁইচ্যা থাকনের কাম শ্যাষ হইয়া গ্যাছে।

– ক্যান, কি অইছে তোমার?

– আমার প্যাডে বাচ্চা।

– বিয়া হইলে তো বাচ্চা আইবই।

– আমার বিয়া অয় নাই।

– হায়! হায়! থয় বাচ্চা আইলো ক্যামনে?

কইতে চায় না, বুঝলেন ভাই! অনেক জোরাজুরির পর হ্যায় কইলো – আমি আর মায় থাকতাম ভাড়া ঘরে। বাপের মুখ এই জনমে চক্ষে দেখি নাই। মায় বাসায় কাম করত আর আমি গার্মেন্টসে চাকরি করতাম। দুইজনার আয় দিয়া সংসারডা কোনরকমে চইল্যা যাইত। মাসের শ্যাষকালে আইস্যা একডা টেহাও থাকতনা। এমুন সময় মায়ের গায়ে জ্বর আইলো। একেবারে কি জ্বর মরনের অবস্থা। মায়রে দেখনের লাইগ্যা দুই-তিন দিন গার্মেন্টসে যাইতে পারি নাই বইল্যা মাসের শ্যাষে বেতন দিলোনা। একদিন মায় আমারে ডাইক্যা কইলো – সখিনা , আমি মনে কয় আর বাঁচুম নারে মা। তুই গেরামে চইল্যা যা। হেইখানে গিয়া কাম কইর‍্যা খা। এইহানে আর থাকিসনারে মা। মায়ের কথা শুইন্যা আমি কইলাম– তোমারে ছাইড়্যা যামুনা মা। মরলে দুইজন একলগেই মরমু। শ্যাষকালে কোন পথ না পাইয়া কাম নিলাম খারাপ পাড়ায়। তারপর ক্যামুন কইর‍্যা যেন পেডে বাচ্চা আইলো। হগলেই ফ্যালায় দিবার কয়। ফ্যাল্‌তে মনে চায় না তাই রাইখ্যা দিচি। এহন ম্যানসে কত খারাপ কথা কয়, গাল মন্দ করে, মায়ও আমারে খ্যাদাইয়া দিল। সখিনার কথা শুইন্যা আমি কইলাম– বাচ্চাডার বাপ যেই হ্যার কাছে গিয়া ব্যাবাক কথা খুইল্যা কও। – আমি ক্যামনে কমু। থাকছি তো

কতজনের লগে। কারে ধরমু কেউ স্বীকার করব না। হগলেই দুর দুর কইর‍্যা খেদাইয়্যা দিব। – থয় এহন কি করবা? – মইর‍্যা যামু। হ্যায় ও মইর‍্যা যাইব আমি ও মইর‍্যা যামু , কাম শ্যাষ। অনেক ভাইব্যা চিন্তা শ্যাষকালে সখিনারে কইলাম– আমি তোমারে মরতে দিমুনা। তোমারে বিয়া করমু। হেই বাচ্চার বাপ হমু আমি। তোমারে আর খারাপ পাড়ায় কাম করতে দিমুনা। আমার কথা শুইন্যা সখিনা আমারে জড়াইয়্যা ধইর‍্যা কইলো– আপনে মানুষ না, ফেরেশতা। – যাই হই আমি, এহন চলো। – কনে যামু? – আমার ঘরে। সখিনারে নিয়া ঘরে আইলাম। পরের দিন সকালে বিয়া কইর‍্যা হ্যার মায়ের কাছে যাইয়্যা দূরে একডা বাসা ভাড়া কইর‍্যা রাইখ্যা আইলাম। লোকটির কথা আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনে যাচ্ছি। এমন গল্প বা এমন কাহিনী সচরাচর যাত্রা,সিনেমা বা নাটকে দেখা যায় কিন্তু বাস্তবে নয়। বাস্তবে এমন ঘটনা ঘটতে পারে তা একেবারেই অবিশ্বাস্য। আমি লোকটির মুখের দিকে চেয়ে আছি। ক্ষণকাল চেয়ে থাকার পর দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে ভাবছি আর ভাবছি হঠাৎ লোকটির কথায় সম্বিৎ ফিরে পেলাম লোকটি আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল– বিয়া ক্যান করছি জানেন ভাই? – কেন?– হেইদিন পেপারে একখান ছবি দেইখ্যা চক্ষে জল আইস্যা গেছিল। – কি দেখেছেন? – লেহাপড়া জানিনা। হেইদিন ছগির ভাই একখান পেপার আইন্যা দেখাইলো, দ্যাখলাম চান্দের লাহান একডা বাচ্চা ডাষ্টবিনে পইড়্যা রইছে। কারা যেন এই বাচ্চাডারে ফ্যালাইয়া গ্যাছে। কাউয়া (কাক) ঠোক্কর দিয়া গালের একপাশের মাংস খাইয়্যা ফ্যালাইছে। তাই ভাবলাম সখিনা যদি হ্যার বাচ্চাডারে ফ্যালাইয়া দিত তহন কাউয়া এমুন কইর‍্যা ঠোক্কর দিয়া খাইত আর মইর‍্যা গ্যালে দুইডা জীবন মইর‍্যা যাইত। কামখান ঠিক করি নাই ভাই? – হ্যাঁ ভাই, আপনি যা করেছেন সত্যকার একজন প্রকৃত মানুষের মত কাজ করেছেন – কি যে কন ভাই। মানুষ তো হইলেন গিয়া আপনেরা, লেহাপড়া জানা শিক্ষিত মানুষ। এহন যাই ভাই। ট্রেন আইতাছে। মাল নামাইতে হইব। লোকটি চলে গেল। একদৃষ্টিতে তার গন্তব্যের পানে চেয়ে রইলাম আর ভাবতে লাগলাম আমরা যাদেরকে মূর্খ এবং নীচু লোক ভাবি তাদেরই মধ্যে এমন মহৎ মানুষের অন্ত নেই। সখিনার পেটের বাচ্চাটা হয়তো আমাদেরই সৃষ্টি নতুবা ওদের সমগোত্রের কারও সৃষ্টি। সখিনার মত অসংখ্যা নারীর জীবনে এমন ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ কি সেই লোকটির মত সখিনাদের এমনভাবে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে নিষ্পাপ দু'টি জীবন বাঁচাচ্ছে? হোটেল বয়কে লোকটির নাম জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম লোকটির নাম 'জমির আলী'। তারপর বেশ কয়েকবার সেখানে গিয়েছি কিন্তু একটিবারের তরে ও জমির আলীকে আর দেখিনি। জানিনা সখিনার সাথে তার সংসার টিকে আছে কি না। টিকে থাকবে সে বিশ্বাস আমার আছে। কারণ পেপার এ ডাষ্টবিনে পড়ে থাকা একটি বাচ্চার দৃশ্য দেখে যার চোখে জল আসে সে অন্ততঃ সখিনার বাচ্চাকে কাকের ঠোকর থেকে রক্ষা করবেই। সখিনার সন্তানকে কাকে ঠোকর দিতে পারবেনা – কখ্খোনো না ॥

খন্দকার মোঃ আবদুল গণি, নাটোর